রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক - অসমান্তরাল কোরাস

পিনাথ সেন

ভাই দ্বিজুবাবু তোমার সেই গানটা, 'প্রতিমা দিয়ে কি পুজিব তোমারে', দিলীপের গলায় একবার শুনি– দিলীপ গাও। রবীন্দ্রনাথ তাকে অনুরোধ করলেন, দিলীপ ধরল–

প্রতিমা দিয়ে কি পুজিব তোমারে/ এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা... দ্বিজুবাবু তোমার এই গানে প্রকৃতিকে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা যায় না যে মহৎ বৃহৎ তাকে তুলনায় আনতে প্রয়োজন বিশ্ব প্রকৃতির অনুষঙ্গকে, আমি আকাশকেও প্রকৃতির নবরূপ বলে ভাবি। বৃহৎ মহৎ ও সুন্দরকে হৃদয়ে স্থাপন করতে গেলে যে শুদ্ধতার প্রয়োজন নেই শুদ্ধতা বিরাজ করে শশী, তারা, রবি আর সাগর এবং বিশ্ব প্রকৃতিতে। বিশ্বপ্রকৃতির গানে ও চিন্তায় তোমার মেধার মেঘ ঘুরে বেড়ায়। তুমি একে অধ্যাত্মবোধ বলে অস্বীকার করলেও আমি তা করি না। বড়ো সুন্দর এই গানের মহিমা। সুরেতে ঘুরে বেড়ায় বিদ্যুতের ঝলকের মতো ঠুংরির আবেগ গজলের দিশা। বাণীর রূপকল্পনা মেঘের মত ভেসে যায়। এই গানকে শুধুই প্রকৃতির গান বলে ছেড়ে দেওয়া যায় না বিশ্ব প্রকৃতিকে রূপে আনা হয়েছে। গানের বীজেই এই বাণী লুকিয়ে থাকে। তুমি চিন্তা ও মেধার সঙ্গে অজানা এক বেদনা মিশ্রিত করে তাকে প্রকাশ করেছে। এই তো মহৎ গানের নমুনা। রূপকল্প গানের আনতেই হবে, সেই তো গানের প্রাণ।

গান ও কথা থাকতেই দ্বিজেন্দ্রলাল কণিকাকে অনুরোধ করলেন– মোহর, তুমি গাও না রবিবাবুর সেই গানটি ''আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে/ তখন কে তুমি তা কে জানত– মোহর ধরলেন গানটা। সবাই মুগ্ধ শ্রোতা। গানটা শেষ হবার বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল দিলীপ– বাবা, এই গানটাকে তুমি কেন বলেছিলে অশ্লীল, এর আবেদন দেখেছিলেন। যৌন আবেদন ক্ষুদ্র নয়, এই আবেদনকে শব্দে বিদ্যুতের ছোঁয়া এনে তবেই আয়ত্ত করা যায়। এ খেলা তো ব্যক্তিগত কোনো নারীর সঙ্গে খেলা নয়, কিন্তু যে সৌন্দর্যবোধ, সৃষ্টিরহস্য তার সঙ্গে খেলা, খেলার সময় তা ততটা অনুভব করা যায় না। খেলার মধ্যে যে উন্মাদনা থাকে তাতে অনেক কিছু ভুলে যাওয়া থাকতে পারে। খেলার সনে কার সনে যে খেলা এটা উপলব্ধি করা যায় না।

–দিলীপ, আজ আমি তোমার সঙ্গে এক মত। আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার মতকে, কেননা এই মুহূর্তটাকে এখন ভাবতে পারি, আমার শুধুই খেলার মুহূর্ত ছিল সেদিন। যৌন পরশের প্রতি আস্থার কথা মনে আনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারিনি। সত্য রবিবাবু ভুল হয়েছিল, যৌন আবেদন, আদিরসাত্মক সঙ্গীত হিসাবে চিহ্নিত করা। আজ বেশ অনেকটা সময় কেটে গেছে, আপনার ১৫২ বছর চলছে, আর আমার ১৫০ বছর। আপনি অনেক জীবন্ত, প্রাণবন্ত, একলা স্বীকার করতে আজ কোনো কুণ্ঠা নেই। রবিবাবু, আজ যখন সুযোগ পাওয়া গেছে, প্রায় আমরা প্রত্যেকেই স্পষ্ট করে প্রত্যেকের মুখ দেখতে পাচ্চি না, দূরে একটা প্রদীপ জ্বলছে, এই পরিবেশে ভিতরকার সত্য কথা বলতে ইচ্ছা করছে, রবিবাবু আপনি শুনলে হবে না, আমার ভুলটা ধরিয়ে দিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করলেন– দ্বিজু বাবুর 'জীবনটা তো দেখা গেল' এই গানটা শোনানোর জন্য। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় গান ধরলেন।

–সহজ ভঙ্গিমায় বলতে বলতে কত গভীরে চলে যাওয়া গেল। জীবনটাকে কোলাহল বলার কারণ তোমার ব্যক্তি জীবন। বিলাতে কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রি নিয়ে এসেই এদেশে তোমার ভালো চাকরি জুটল না। শেষমেশ ডিপুটি-র কাজ। কিন্তু এক জায়গায় স্থিতু হবার চাকরি নয়। সারা দেশময় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। স্ত্রী নেই। সন্তানরা ছোটো, সত্যই একটা বিরাট বিভ্রাট যেন জীবনটা। এই ব্যক্তিজীবনের যে তিক্ততা তা চলে এসেছে। কিন্তু দ্বিজুবাবু তুমি তো এখানে থেমে থাকনি। মরণটাকে দেখার ভিতর দিয়ে অতল জলের গভীরতাকে স্পষ্ট করতে, গভীরে যেতে চেয়েছে। জীবনকে খুব গভীর হতে দেখার ব্যাকুলতা, এই ব্যাকুলতা সৃষ্টির উৎস। এটা সুন্দরভাবে ধরা হয়েছে। সৃষ্টির উৎসের কাছে পৌঁছানোর জন্য ব্যক্তিজীবন আর অত প্রাধান্য পাচ্ছে না। এটা আমি মনে করি একটা মহৎ গান। আধুনিক বাংলা গানে এর প্রয়োগ থাকলে আগামী চূড়ান্তপর্বে রকগানের জন্য ধন-রত্ন, সংগ্রহের সময় তোমার গানের প্রয়োজন হচ্ছে। গানের জীবন থাকে, সেই জীবন গানকে মরতে দেয় না।

কৃষ্ণা মোহরকে আবেদন করল– মোহর, তুমি 'আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি' গানটা গাইবে। মোহর গান ধরলেন...মোহর গান থামাতেই দ্বিজুবাবু বললেন, রবিবাবু আমি এখন ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছিনা, কেন এই গানটাকে আমি অশ্লীল, আদিরসাত্মক গান বলে আখ্যা দিয়েছিলাম। ফুলের স্বাদ নেওয়ার অর্থ আদিরসাত্মক প্রেরণার দিকে যাত্রা নয়, জীবনের ব্যাপকতাকে অনুভব করার আকুতি, সেই দুর্গম পথে যাত্রা, দুর্গমের মধ্য দিয়ে যাত্রা না করলে সুন্দরের প্রতি আস্থা জন্মায় না। কেন ভুল করলাম রবিবাবু? আমার মনে হয়, গানের ক্ষেত্রে আমি যেমন রূপকল্প ব্যবহার করেছি, তুমিও তা করেছ, আমিও পৌঁছাতে চেয়েছি একই দিকে– এর জন্য সময় প্রয়োজন, দুর্গম পথে যাত্রা করতে হয়, হয়তো তোমার ক্ষেত্রে যাত্রাটা থাকলেও অনুভবে আন্তরিক বোধের অভাব ছিল, এটা বলতে বাধ্য হলাম।

–তোমার 'ধনধান্যপুষ্প ভরা' গানটা তো আমার ভীষণ ভালো লাগে। সত্যই প্রকৃতিকে জাতীয়তা বোধের সীমার মধ্যে আনা বেশ কঠিন কাজ, সেটা তুমি এত সহজে করে ফেললে, আমি মুগ্ধ। রবিবাবু চুপ করলেন, শান্ত নীরবতা ঘরে বিরাজ করতে লাগল। প্রদীপের শিখা আত্মার আত্মীয় হয়ে দীর্ঘ শিখায় জলে যাচ্ছিল। আসরের স্তব্ধতা ভেঙে গেল দ্বিজুবাবুর কর্কশ আওয়াজে– রবিবাবু আপনার এক অনুচর (হ্যাঁ এই শব্দটাই ব্যবহার করলেন দ্বিজুবাবু) আমার পরম দেশ প্রেমের গান, যা রচনা করা আমার সাধনার বিষয় ছিল, –বঙ্গ আমার! শরাব আমার! পানীয় আমার! আমার পেগ! –সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। হ্যাঁ আমি মদ্যপান করতাম। কিন্তু কেন করতাম তার কারণগুলো নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ তার ছিল না। একে আমার চাকরি-জীবন সুস্থ ছিল না, ইংরেজ সুস্থ রাখতে চায়নি, দেবে এ বিশ্বাসও আমার ছিল না। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে আমি যে গানগুলো লিখেছিলাম, জানেন তা একদিন সকলের অজান্তে নাটক লিখতে শুরু করি, রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। রবিবাবু কী

আশ্চর্য মিল, আপনার স্ত্রী মারা গেলেন ১৯০২ সালে, আমার স্ত্রী ১৯০৩ সালে, এক বছর পরেই। দেখুন আপনার ছিল আশ্রম, বিদ্যাচিন্তা দেওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ। আপনি অস্থির হওয়ার মতো সময় পাননি, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ছিল ঠিক বিপরীত, একে চাকরির উৎপাত, সন্তান দুটি ছোটোছোটো, স্বদেশভক্তির গান লিখতে পারছিলাম না নানা কারণে, তাই নাটক লিখতে শুরু করি। মদ্যপান শুরু করি। এটা আমার খুবই ব্যক্তিগত দিক, তাকে আঘাত করা হল। স্থির হওয়া যায়। একে অস্থির জীবন, তার উপর এই বিডম্বনা, আমি বিচলিত হয়ে পড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কৃষ্ণা, 'বঙ্গ আমার জননী আমার', এই গানটা গাইবে। কৃষ্ণা গান ধরলেন...

—এই গানের শক্তি ও জীবনের প্রাচুর্য্যে সকলের মধ্যে চিন্তার রেশ বিছিয়ে দিল। এ গানটার কোনো দীনতা প্রকাশ করা হয়নি বরং ভারতবর্ষের উজ্জ্বল ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে। বীরত্বের প্রতীক এই গান। কথা থামিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন, বিতর্কটা শেষ হয়ে যাক। কিন্তু যা শেষ হওয়ার নয় তা শেষ হবে কীভাবে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু পড়তে যাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দ্বিজু তোমার মনে পড়ে পদ্মায় বোটের উপর কত দিন দুই পরিবার একসাথে কাটিয়ে দিয়েছে, গানে কবিতায় আর প্রকৃতির মুগ্ধতায়। সুরবালা সত্যই সুন্দর রুচিশীলা, মৃণালিনীর সঙ্গে দারুণ সখ্যতায় বসে বসে গল্প করত। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ত, স্রোতে স্রোতে জ্যোৎস্নার গান যেন। আমার গান করতাম। কত বড় মধুর স্মৃতি। কত আলোচনা হত, তুমি তোমার পিতার সম্পর্কে বলতে, তোমার বাবা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেওয়ান ছিলেন। কৃষ্ণনগরে একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল তোমার বাবাকে ঘিরে। রামতনুবাবু তখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন। সেখানে ব্রাহ্মসভা প্রস্তুত হয়েছিল। সংস্কৃতির বাতাসটা ছিল উদার। তুমি তার মধ্যে মানুষ। তুমি লেখায় বুদ্ধ ধর্মকে যেমন মানো, একই সঙ্গে চৈতন্যদেবকে, লালন সবাইকে মান্যতা দাও। কিন্তু আবার বিলেতে নিজেকে হিন্দু বলতেও তোমার আটকায় না। আমার লেখাগুলো কিন্তু সেভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেনি। এটা আমার আভিজাত্য— বোধ বললেও আমি অস্বীকার করব না আজ। আমি ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী শুধু নন, তার একজন প্রচারক বলা যেতে পারে। না, দ্বিজু, আমি প্রচারক একথা বলা যায় না, কারণ আমি কাউকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হতে বলিনি। প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দিলেন, গুরুদেব, আপনার হয়ত মনে আছে দ্বিজু বাবু আপনার 'সোনার তরী' -কে অসাড়, ঝাপসা, দুর্বোধ্য কবিতা বলেছেন। কবিতার ভাব তার কাছে পছন্দ হয়নি। কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসটি দারুণ পছন্দ করে ছিলেন, কিন্তু কেন?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, দ্বিজুবাবু এই ব্যপারে আমার কিছু ধারণার কথা বলতে পারি —'সোনার তরী' তোমার পছন্দ হয়নি, এব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। পছন্দ হওয়া-না-হওয়া ব্যক্তিনিরপেক্ষ। এখানে কবির কিছু বলার থাকে না। কিন্তু 'গোরা' তোমার পছন্দ হবার পিছনে যে কারণগুলো থাকতে পারে, তার একটা কারণ গোরা যখন যেটা করেছে তা প্রচারিত করেছে এবং প্রচন্ড বিশ্বাসে করতে চেয়েছিল। গোরার এই স্বভাব তোমার মধ্যে বিদ্যমান বলে আমি মনে করি। কিন্তু শেষ পর্বটা কেন পছন্দ হল, সেটা আমি বুঝে উঠতে পরিনি? দ্বিজুবাবু উত্তর দেবার ভঙ্গিতে বললেন, এই যে প্রভাতবাবু আপনাকে গুরুদেব বলে ডাকলেন, আপনি কী তাকে দীক্ষা দিয়েছেন, আপনি কী দীক্ষাগুরু, জানি না। তবে উনি একজন চেলা বলা চলে। এ চেলাদের দ্বারা আপনি ঘিরে থাকতে বেশি পছন্দ করেন? —হয়তো!

—কিন্তু কারণটা এখনও বলোনি?

—গোরার উগ্রতা আমার স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে মেলে। কিন্তু শেষটায় এসে গোরা যখন জানতে পারল যে আইরিশ এবং প্রায় পরিত্যক্ত এক শিশু, সেই অবস্থান থেকে তাকে মানুষ করা হয়েছে, যারা ছেলের মতো মানুষ করেছেন তারা কিন্তু না ব্রাহ্ম না হিন্দু। হিন্দু ধর্মে এই উদারতা আপনি সুন্দর ভাবে বলেছেন, এটা আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু গোরার ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়া আমার অপছন্দের। একই ভাবে অপছন্দের গীতিনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'। এটা আমার আদি রসাত্মক ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি।

—কাম একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে সুন্দর নয়। এ সুন্দর হতে পারে, কিন্তু সুন্দর না হয়ে কুৎসিতও হতে পারে। আমি প্রথমত বলব যে, কাম কুৎসিত। কাম হতে উগ্রতা কমে যে সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে তাই তো প্রেম, তাই তো সুন্দর। সেই সুন্দরের আরাধনা মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা, দ্বিজু তমি তা অস্বীকার করতে পার। দেখো দ্বিজু এখানে তর্ক করতে গেলে বৃথা ক্লান্তি হবে। বরং মোহর একটা গান ধরো না, পরিবেশের ঝাঁজটা কমিয়ে এনে আলোচনায় আসব 'আনন্দবিদায়' প্রসঙ্গে দ্বিজু তোমার নিশ্চয় আপত্তি নেই।

—না, আমার আপত্তি নেই, তবে সামান্য পানীয় সেবন করব আমি আপত্তি করবেন না নিশ্চয়?

—না, কেন আপত্তি করব। আমার বড়দা জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু তার মদ্যপানের স্বভাব ছিল। আমি আপত্তি করিনি। জ্যোতিদাদা গোত্র ছাড়া ব্যক্তি, অধিক মদ্যপান করতেন, আনার আপত্তি কেন থাকবে। কিন্তু দুঃখ হয়, প্রতিভা তার এত বহুমুখী ছিল যে কোনো কিছুই সময় দিয়ে করতে পারেননি, প্রতিভার দ্যুতিতে নিজে জ্বলে গেলেন। দ্বিধা, এখন আমার কাছে শিক্ষার বিষয়। দেখো দ্বিজু, শিল্পীদের সৃষ্টিকারীদের আত্মিক অহং থাকার প্রয়োজন আছে। আত্মায় ফুল ফোটাতে না পারলে আত্মশক্তি বিকশিত হবে কীভাবে, সেই আত্মশক্তিকে তুমি অহংকার বলে চিহ্নিত করলে, এতে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। তোমার অহং না থাকলে তুমি শিখতে পারতে। সুতরাং অহং থাকে, তা আত্মশক্তির বিকাশ, সৃষ্টিতে তা শক্তি রূপে বিরাজ করে। আসলে তুমি নানান চাপে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলে, এতে আমি দুঃখ পেয়েছি, আমার জন্য নয়, তোমার বুদ্ধি হঠাৎ কেন ঘুরপথ ধরতে চাইছে, সেই কথা ভেবে। শান্তিদেব 'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্যটা কি তোমার দলবল নিয়ে একবার করে দেখাবে। আমিও বুঝে নিতে চাই দ্বিজুর কথায় এই গীতিনাট্যটা কোন্ অংশে ও দেখতে পেল আদিরস। এই প্রসঙ্গে তোমাকে সামান্য দু-একটা কথা বলতে চাই। কোনারক মন্দির কি বন্ধ করে দেবে, কিংবা নিষিদ্ধ করবে ইলোরা-বিহার, খাজুরাহো। এগুলো ভারতীয় কলার স্বরূপ না কামশাস্ত্রের প্রতিরূপ। তোমার এখনই কিছু বলতে হবে না আগে নাটকটা অনুভব করি। লক্ষ্য স্থির না তাকলে দিগভ্রান্ত হতে বেশি সময় লাগে না। তুমি শুধু পড়েছ, এবার এরা করে দেখাবে— শান্তিদেব শুরু করে দাও। কৃষ্ণা আমি চাই তুমিও গানে গলা দেবে, দিলীপ তুমিও।

কিন্তু শুরু করার মুহূর্তে প্রতিমাদেবী এসে সভাকে সম্বোধন করে বললেন— অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। মাঝ রাতের পাখি ডেকে গেছে। আর কি সময় নেওয়া ঠিক হবে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীর সুরে সুরে ধ্বনিত করে বললেন, ঠিক আছে চিত্রাঙ্গদা আজ করতে হবে না। কিন্তু 'আনন্দ

বিদায়' সম্পর্কে আলোচনাটা বড়ো প্রয়োজন। এটা শেষ করতে হয়তো প্রভাতের পাখি ডেকে উঠবে, কিন্তু প্রভাত পাখির ডাকে বন্ধুত্বের সুর থাকে। সেটা আজ আমাদের প্রয়োজন, দ্বিজুবাবু তোমার নিশ্চয় আপত্তি নেই তাতে।

—না নেই রবিবাবু। পড়ার আগে এবং ব্যাখ্যা শোনার আগে আমার একটা চিঠির সামান্য অংশ পড়তে ইচ্ছে করছে, এটা লেখা হয়েছিল প্রথম-র চিঠির জবাবে...

ভাই প্রমথ

বঙ্গ সাহিত্য নৈতিক চাবুকের দরকার নেই —সত্য। কিন্তু আনন্দ বিদায়ের চাবুক আট বছর আগেকার (অভিনয় ১৯১২, লেখা ১৯০৫) অধূনা সেটা অভিনীতি হয়েছে—এই মাত্র।

রবীন্দ্রবাবুকে এই বিষয়ে, কাব্য বিশারদ, ক্ষীরোদ রায় চৌধুরী পভৃতি— অনেকে আমার আগে চাবকাইয়াছেন। আমি রবীন্দ্রবাবুকে আক্রমণ করিলেই শহরে এত আর্তনাদ ওঠে কেন— আমি তাই ভাবি। অথচ আমি উচ্চকণ্ঠে রবীন্দ্রবাবুর 'গোরা' 'য়েতে নাহি দিল' (কাব্যের উপভোগ প্রবন্ধ) ইত্যাদির প্রশংসা করেছি। রবীন্দ্র কি দেবতা? তাঁর প্রকাশিত পুস্তকের তীব্র সমালোচনা কি ধর্ম মতে নিষিদ্ধ?

আর আমি নৈতিক চাবুকও অন্যান্য কবির প্রতি প্রয়োগ করেছি। তাদের ভক্তরাও এরূপ আর্তনাদ করে না ও লেখার বিদ্বেষ দেখে না। রবির গোঁড়া ভক্তরা এত নীচ?

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে আছেন দেখে বাকিরা এত নীচ এই ব্যক্তিগত আক্রমণ যে হজম করলেন। সবাই বরং অনুরোধ করলেন 'আনন্দ বিদায়' -এর অংশ বিশেষ পড়া হোক, সেই বিষয়ে আলোচনা করা সকলের আধিকার থকাল। দ্বিজুবাবু হাসলেন, কিন্তু ঠান্ডা হাসি। বাঘের গুহায় এসে বসেছেন তা তিনি বোঝেন। নিজের বুদ্ধি মতো যা সত্য তা প্রচার করতে তার কোনো কুণ্ঠা থাকে না। পড়া শুরু করলেন দিলীপ রায়, দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র ও একজন রবীন্দ্রভক্ত, যার আন্তর্জাতিকস্তরে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলে। কিন্তু চিন্তার সঙ্গে তিনি যুক্ত এবং সত্যের দিক নির্ণয় করতে তিনি অভ্যস্ত।

—কুশীলবগণদের সম্পর্কে কিছু পড়ছি না। কিন্তু প্রস্তাবনাটি পড়া দরকার বলে মনে হচ্ছে, পড়ছি—

এটা এক অভিনব নাটিকা।
ইংরাজি ভাষাতে একে বলে 'প্যারডি'—
জানাতে পাঠক ও পাঠিকা।।
প্যারডিতে প্রহসনে পিষিয়ে,
গুলে নিয়ে, অপেরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিষ্টে—
.....
নাহি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি,
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর,
লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তাঁরও মস্তকে ছোটখাট চাঁটিকা।।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দ্বিজু ভাই পরম বৈষ্ণব হোক বা না হোক, তিনি কৃষ্ণকে নিয়ে রসিকতা সহ্য করতে পারবেন না। এবং কৃষ্ণকে নিয়ে কিছু বলতে গেলে তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে বলতে হবে। এটা তার নৈতিকতা। কিন্তু নীতি কথা এক জিনিস আর সাহিত্য অপর এক জিনিস। দ্বিজুবাবু নিশ্চয় বোঝেন, গ্রামীন কৃষ্ণ যেমন আছেন তেমন রসিকজনের কৃষ্ণও আছেন আবার বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিশেষত গীতগোবিন্দ, তান্ত্রিক শাস্ত্রে কৃষ্ণ অন্যভাবে এসেছেন। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ সাহিত্যে নেই। থাকলে তাদের আগে বাতিল করে দিতে হয়। কিন্তু বাতিল করে দিলে ভারতসংস্কৃতির রূপ কেমন হবে তা ভেবে দেখার আছে? কৃষ্ণের সঠিক কোনো রূপ পাওয়া ভীষণ কঠিন, কারণ কাব্য-পাঁচালিতে তার বিচরণ বাস্তব অবস্থান আর কারও নেই। দ্বিজুবুবু আমার এ মন্তব্য না মানলে আমার কিছু করার নেই। আমাকে তাই অনেকের উপর নির্ভর করতে হয়ছে। এটা যদি আমার অন্যায় কাজ হয়, আমি মানি বা না মানি তাতে নিশ্চয় তার কিছু এসে যায় না। দ্বিজুবাবু কিছু বললেন না কিন্তু প্রভাতবাবু বললেন, আমাদের লাইব্রেরিতে এইরকম নানা পুঁথি সংগ্রহ করে রাখা আছে, উনি পড়তে চাইলে তিনি পড়তে পারেন। দ্বিজুবাবু মৃতু হাসলেন।

প্রথম দৃশ্য (প্রথম অঙ্ক)

আনন্দ ও তাঁহর খুল্লতাত দন্ডধারী
আনন্দের গীত
দুখের কথা বলবো কত,
ছেলেটার বিগড়েছে মাথা।
আছে নাকি সুরে কথা,
আর লম্বা লম্বা চুল রাখা।
মাঝে মাঝে, আমার বিশ্বাস,
ফেলে যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
আছে আবার উদাসভাবে

আকাশ পানে চেয়ে থাকে।

–প্রচলিত কবিদের সম্পর্কে এই ধরণের ব্যঙ্গ অনেকেই করে তাকে। কিন্তু আমি প্রকৃত কবিদের মধ্যে এই আচরণের আবরণ দেখিনি। এটা কবিদের প্রতি একটা ব্যঙ্গ। সূচনায় সাধুবাদ দেওয়া যায়। প্রচলিত ধারণায় বিশ্বাসী দ্বিজুবাবু, এটা অনুমান করতে পারি। আমি স্বীকার করছি আমি কোনো ব্যঙ্গ কবিতা বা নাটিকা লিখতে পারিনি। এটা আমার অক্ষমতা না রুচি বিরুদ্ধ কাজ তা ঠিক বলতে পারব না। তারপর... আনন্দ (গীত)

সহচরী সভ্য নারী
ঘিরে তারে সারি সারি–
সখের থিয়েটার ভারি
ছেলেটা উড়চ্ছে টাকা
কি ব'ব্‌বো আর তোমায় আমি,
ছেলেটা বিগড়েছে কাকা।

–ব্যঙ্গ করতে গেলে এই ভাবে শব্দ ও শব্দের ব্যবহার আসতেই পারে। সামনে কাউকে দাঁড় করিয়ে রচনা করলে বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যায়। দ্বিজু তুমি যথার্থভাবেই শুরু করেছো, অভিনন্দন থাকল... মল্লিকা– উঁহু! এখনো তাকে চোখে দেখিনি–

গীত

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাব্য পড়েছি
অমনি নিজের মাথা খেয়ে বসেছি।

–এটা আমার একটি গানের সামান্য অংশের ব্যবহারে প্যারোডি রচনা চেষ্টা। গানটা শুনতে আমার ইচ্ছা করছে, কৃষ্ণা গাইবে। কৃষ্ণা গাইতে শুরু করলেন...

–রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে; গানের বদলে কাব্য বসিয়ে। কিন্তু ভাব ও চিন্তার বিস্তার এখানে নেই, থাকে না; দ্বিজু বাবু তাই তো। রাধাকৃষ্ণকে কি দ্বিজুবাবু এখানে লৌকিক করে আনা হল না, ভালোই করেছো, না হলে ব্যঙ্গ জমত না। যিনি লৌকিক বিষয়কে পছন্দ করেন না, আবার সেই বিষয় টেনে আনতে পারেন অন্যের গানের ভাবকে সুস্থ ভাবে না নেবার জন্য ভালো। পড়ে যাও...

গীত। (নেপালের গীত চলিল)

সে আসে ধেয়ে– এন ডি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্
চায়ের গন্ধ পেয়ে।

–দিলীপ এটা তো আমারই একটি গানের প্যারোডি। গানটা তোমার মনে পড়ছে। মোহর গানটা ধরো তো–

সে আসে ধীরে,
যায় লাজে ফিরে।
রিনিকি ঝিনিকি রিনি ঝিনি...

–দেখো দ্বিজু বাবু গানটাতে যেখানে পরমের প্রতি আশ্বাস বাণী অনুরণিত হয়েছে, কোমল পদ পল্লব চল চুম্বিত ধরণীতে, সেই জায়গায় তুমি বসিয়ে দিলে জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিয়ে ড্রইংরুমটি ছেয়ে। দ্বিজুবাবু, রাণীরূপ, বাণীকল্প বলে কবিতায় বা গানে যে চিত্র রচনা করা হয়, তাই কাব্যের ও গীতের বীজ, তাকেই ধরে বড়ো হয়, বিস্তৃত হয়। আসলে তোমার কবিতায় বা গানে এই বাণীরূপের কদর বড়ো কম। এই কম হওয়াকে বলতে পার– বাস্তববোধ। কিন্তু বাস্তববোধের মূলে থাকে সেই গন্তব্যের ছায়া, ছায়টা এক জায়গায় এসে মিশে যায় –সেটা তোমায় কবিতায় বা গানে এই বাণীরূপের কদর বড়ো কম। এই কম হওয়াকে বলতে পার–বাস্তববোধ। কিন্তু বাস্তববোধের মূলে থাকে সেই গন্তব্যের ছায়া, ছায়াটা এক জায়গায় এসে মিশে যায়– সেটা জমি" ইত্যাদি কবিতাগুলো পছন্দ করো, সেখানে বাণীরূপের ঘনঘটা দেখা যায়, যা শুরু করা হয় গল্প দিয়ে। এই গল্পটাই তোমার পছন্দ। কবিতা বা গানে সঠিকটা বলে তেমন কিছু হয় না, উচ্চতা বলে একটা কথা আছে। তোমার তাতে ঘাটতি আছে, এটা আমার ব্যাখ্যা, ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে নয়, এই ধরণের বিষয়ে প্রতি, আমার নিজের প্রতিও সমালোচনা। কী দিলীপ কিছু বলবে মনে হচ্ছে, বলো না, তোমার কথা বলেছি য়ুরোপের একটা মন্ত্র দান; প্রাণের এই অজস্রতা, সক্রিয়তা, বহুমুখিতা, এ না থাকলে মানুষ ভাবতে পারে, হাসতে পারে, কিন্তু নিবিড় ভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে না।...

–একথা আমি খুব মানি। শ্রী অরবিন্দ এই প্রাণ শক্তিকে বলেন The Vital বলেন। উপলব্ধি –realisation –চাই তো বটেই কিন্তু তারও পরে হল প্রকাশ –manifestation, বলেন যে প্রাণ শক্তিই আত্মিক ও বস্তু জগতের মধ্যে ঘটকালি করে–

প্রভাতবাবু বলে ওঠেন, ভাবের বিস্তারই তো সঙ্গীতের বিস্তার। রবিবাবু আর কোনো মন্তব্য না করে বললেন, পড়ো দিলীপ।

সামান্য থেকে পুনরায় পড়তে আরম্ভ করলেন দিলীপকুমার... নেপাল। সাহিত্য-সম্প্রাট্ হব, ঋষি হব।

মলতী । সকলি সম্ভব কলি কালে–
ভূমি শূণ্য রাজা, বিদ্যাবিহীন হাকিম;
নিরক্ষর কাব্য বিশারদ,
বিষয়ী মহর্ষি

যাও ঠাকুরপো যাও নাথ
কি আর কহিব।

—এখানে বড়ো বেশি ব্যক্তিগত আক্রমণ চলে এসেছে। আগে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম— বলে থাকলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজেকে তিনি যেন সংযত করতে পারছিলেন না, তবুও শান্ত গলায় বললেন, দ্বিজুবাবু, প্যারোডিতে ব্যক্তি-আক্রমণ চলে। ভূমিরাজা, মানে তুমি রামমোহন রায়কে বলতে চেয়েছ, যে রাজা সত্য রাজা, দেশটাই তার ভূমি সুতরাং ভূমি-জমির প্রয়োজন হয় না। ভূমিরাজা, আমি এক অর্থে ধরে ছিলাম, এটাই ব্যঙ্গ করার ছল মাত্র; আবার ছলও নয়, ব্যঙ্গই করতে চেয়েছে রাজা রামমোহন ব্রাহ্ম ধর্মের অন্যতম সৃষ্টিকর্তা এবং প্রচারক। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন চেয়েছিলেন। ধর্মের দ্বন্দ্ব থাকে না, দ্বন্দ্বটা আমরা তৈরি করি। তুমি নিজেকে হিন্দু বা আর্য বলে প্রচার করতে চাও, কিন্তু দুটোই পৃথক। হিন্দু ধর্ম নানা কুসংস্কারে ভতি, তুমি তাকেই তোমার আরাধ্য ধর্ম বলে নেনে নিলে। ভাইয়ের মায়ের মিলন দেখলে কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন অনুভব করতে পারলে না, তোমার বংশ পরিচয়ের জন্য। কবি ধর্ম তা হওয়া উচিত নয়, এখানে তুমি পিছিয়ে পড়লে। পিছিয়ে পড়ার জন্য ক্ষমা চাওনি। মনুষ্য ধর্ম তুমি পালন করলে না, রামমোহন যা করেছিলেন। সুতরাং শুধু জাত্যাভিমানী হতে তাকে আঘাত করতে চাইলে, এটা ন্যায় সংগত নয়। 'বিজয়ী মহর্ষি' অর্থে আমার বাবা, জীবনব্যাপি তার মানুষের প্রতি বিশ্বাসটা অনুধাবন করতে পারলে না, এটা তোমার সুস্থ রুচির পরিচয় নয়। আর আমার সম্পর্কে বলেছ, সেই প্রসঙ্গে আমি কিছু বলব না। বলা উচিত নয়। দেখো দ্বিজুবাবু তুমি নিজেই এর জন্য লজ্জিত হবে। সেই সঙ্গে আমি একথাও বলব, সত্যেন্দ্রনাথ এই অংশে এসে জুতো ছুঁড়েছিলেন মঞ্চে। এটা অনুচিত কাজ। ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে যাবার মতো কাজ। তারপর শুনেছি দর্শকরা নাটকটা শুধু বন্ধ করে দেয়নি তোমাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টাও করেছিল। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু আমি তো কোনো কটূক্তি করিনি তার জন্য। এই যে উত্তেজিত না হওয়া, এটা আমাদের ধর্মের প্রধান শিক্ষা। আমি তখন বিদেশে ছিলাম।

প্রতিমাদেবী পুনরায় এসে বললেন, ভোরের পাখি ডাকছে। এবার সকলের বিশ্রাম প্রয়োজন।

এই নিয়ে আর কোনো বিতর্ক হয়নি। কারণ এই নাটকের এই পরিণতির পর দ্বিজুবাবু বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে স্ট্রোকে তিনি মারা যান। তার অনুচরেরা এতটাই বোকা তাকে বিছানার উপর শুইয়ে ঘড়া ঘড়া জল ঢেলেছিলেন। এই জলে তার যাবতীয় লেখাপত্র শুধু ভিজে যায়নি, জলের সঙ্গে অক্ষরগুলো কাগজ হতে খসে যায়। শোনা যায়, এই ঘটনার পর দ্বিজুবাবু রবীন্দ্রনাথকে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লেখা শুরু করেছিলেন। তা শেষ করতে পারেননি। বিতর্ক নিয়ে তার আর বলার কিছু থাকতে পারে না। আপাতত থাক্।